RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION VIDYABHAWAN

MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAMINATION : 2020

Class : X

Subject :- History

Full Marks : 90

বিভাগ- ক

১. সঠিক উত্তর নির্বাচন কর ঃ

উত্তর ঃ

১.১ ক) ইংরেজরা

১.২ গ) বি. ডি. সাভারকার

১.৩ গ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা

১.৪ ক) উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী

১.৫ খ) স্বামী সহজানন্দ

১.৬ গ) ১৮৫৫ খ্রিঃ

১.৭ গ) বোম্বাইতে

১.৮ খ) সি. ভি. রমণ

১.৯ খ) গোদাবরী উপত্যকায়

১.১০ ক) জেমস কোলভিল

১.১১ খ) মুন্ডা বিদ্রোহ

১.১২ ক) বীণা দাস

১.১৩ ক) শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু

১.১৪ গ) জুনাগড়

১.১৫ গ) ১৯৬০ খ্রিঃ

১.১৬ ক) ঊর্মিলা দেবী

১.১৭ গ) গান্ধিজি

১.১৮ গ) ১৯৫৩ খ্রিঃ

১.১৯ গ) ১৯৬১ খ্রিঃ

১.২০ গ) খুশবন্ত সিং

বিভাগ- খ

একটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ উপবিভাগ ঃ ২.১

উত্তর ঃ

২.১.১ গোরা উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

২.১.২ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম চিত্রিত গ্রন্থটি হল ১৮১৬ সালে কলকাতার ফেবিস অ্যান্ড কোম্পানির ছাপাখানা থেকে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের উদ্যোগে প্রকাশিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে অন্নদামঙ্গল কাব্য।

২.১.৩ উষা মেহতা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

২.১.৪ মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হরিচাঁদ ঠাকুর

উপবিভাগ ঃ ২.২.

সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় কর ঃ

২.২.১ সত্য

২.২.২ সত্য

২.২.৩ মিথ্যা

২.২.৪ মিথ্যা

উপবিভাগ ঃ ২.৩

'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখ ঃ

	'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
২.৩.১	জওহরলাল নেহরু	৩) লেটার ফ্রম ও ফাদার টু হিজ ডটার
২.৩.২	বীরেন্দ্রনাথ শাসমল	১) অসহযোগ আন্দোলন
২.৩.৩	রসিদ আলি	৪) আজাদ হিন্দ ফৌজ
২.৩.৪	ডঃ আম্বেদকর	২) পুণা চুক্তি (১৯৩২)

উপবিভাগ ঃ ২.৫

বিবৃতিগুলির সঙ্গে সঠিক বাক্যটি নির্বাচন কর ঃ

২.৫.১ ব্যাখ্যা ৩ ঃ কারণ এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের মনের বিকাশ ঘটাতে পারে নি।

২.৫.২ ব্যাখ্যা ৩ ঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল মূলতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন।

২.৫.৩ ব্যাখ্যা ৩ ঃ তারা ছিল শ্রমিক কৃষকদের ব্রিটিশ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সমর্থক।

২.৫.৪ ব্যাখ্যা ৩ ঃ কারণ তারা বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে চেয়েছিল।

২.৪ এর ম্যাপ শেষ পৃষ্ঠায় আছে

বিভাগ- গ

৩। দুটি অথবা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও ঃ

৩.১ আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

- স্থানীয় ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব হল, স্থানীয় ইতিহাসচর্চার দ্বারা (১) স্থানীয় অঞ্চলের সমাজ, অর্থনীতি, শিল্পকলা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। (২) জাতীয় ইতিহাস চর্চা জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসের মাধ্যমেই জাতীয় ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে।

৩.২ সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ ব্যর্থ হল কেন?

সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০ খ্রিঃ) ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণগুলি ছিল (১) এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই বাংলার বাইরে থেকে এসেছিলেন। তাই বাংলায় তাদের জনভিত্তি ছিল দুর্বল। (২) এই বিদ্রোহ শুরু থেকেই ক্ষুদ্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। (৩) সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই বিদ্রোহ জনপ্রিয় হতে পারে নি। শুরু থেকেই তা দুর্বল ছিল।

৩.৩ নীল বিদ্রোহে খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা কীরূপ ছিল?

বাংলায় সংঘটিত নীল বিদ্রোহে ইউরোপ থেকে ভারত আগত খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। (১) এই বিদ্রোহের সময় তারা নীলচাষিদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি জানায়। (২) তারা নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও শোষণের চিত্র স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে তুলে ধরে। (৩) তারা উপলব্ধি করে যে, নীলচাষিদের দুর্দশা দূর করার জন্য তাদের মধ্যে উন্নত 'খ্রিষ্টানশিক্ষা' ও গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মিশনারি জেমস লঙ নীলকরদের তীব্র সমালোচক ছিলেন।

৩.৪ উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে 'ভারতমাতা' চিত্রটির ভূমিকা ঃ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আঁকা 'ভারতমাতা'-এর চার হাতে বেদ, ধানের শিষ, জপের মালা ও শ্বেতবস্ত্র দেখিয়েছেন। এগুলির দ্বারা তিনি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের (১৯০৫খ্রিঃ) যুগে ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশিয়ানা ও জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এই চিত্রের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদকে মাতৃত্বের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, কারণ গৈরিক বসন পরিহিত চারহাত যুক্ত ভারতমাতা ছিল মানবী ও দেবী শক্তির বহিঃপ্রকাশ।

৩.৫ চার্লস উইলকিনস কে ছিলেন?

প্রাচ্যবাদী পন্ডিত ছিলেন চার্লস উইলকিনস্। তিনি পঞ্চানন কর্মকারের সহযোগিতায় বাংলা মুদ্রাক্ষর খোদাই এবং অক্ষর ঢালাই-এর কাজ করেন। তার তৈরী বাংলা মুদ্রাক্ষরের সাহায্যেই হ্যালহেড তাঁর বাংলা গ্রামার বইটিতে উদাহরণস্বরূপে বাংলা মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। তাই তিনি 'বাংলার-গুটেনবার্গ' নামে পরিচিত। 'বাংলা মুদ্রণ শিল্পের জনক' বলা হয়।

৩.৬ কৃষক আন্দোলনে বাবা রামচন্দ্রের ভূমিকা ঃ

বাবা রামচন্দ্র ছিলেন মহারাষ্ট্রের এক ব্রাহ্মণ কৃষক নেতা যিনি অসহযোগ আন্দোলন পর্বে যুক্ত প্রদেশে কিষাণ সভার অধীনে প্রতাপগড়, রায়বেরিলি, সুলতানপুর ও ফৈজাবাদ জেলার কৃষকদের নিয়ে তালুদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জোরজবরদস্তি কর আদায় বন্ধ করা বা করের পরিমাণ হ্রাস করা, বেগার প্রথার অবসান, অত্যাচারী ভূ-স্বামীদের সামাজিক বয়কট ইত্যাদি। তিনি 'কুর্মি কিষাণ সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২০ খ্রিঃ অক্টোবর মাসে বাবা রামচন্দ্র ও জওহরলাল নেহরু 'অযোধ্য কিষাণ সভা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এরপর থেকে যুক্তপ্রদেশের কৃষক আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়।

৩.৭ মাতঙ্গিনী হাজরা স্মরণীয় কেন?

মাতঙ্গিনী হাজরা ছিলেন ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদানকারী একজন গান্ধিবাদী নেত্রী। ১৯৪২ খ্রিঃ ২৯ সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের তমলুকে একটি থানা দখল করার নেতৃত্ব দেন কৃষক পরিবারের ৭৩ বছরের বৃদ্ধা 'গান্ধিবুড়ি' নামে খ্যাত মাতঙ্গিনী হাজরা। পুলিশের গুলিতে জখম হয়েও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত তিনি জাতীয় পতাকা আগলে রেখেছিলেন।

৩.৮ দলিত কাদের বলা হয়?

সনাতনী বর্ণব্যবস্থায় বা জাতিভেদ প্রথার নিরিখে 'দলিত' বলতে তথাকথিত অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীগুলিকে বোঝানো হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের শোষিত ও নির্যাতিত এবং পিছিয়ে পড়া অস্পৃশ্য জাতি যারা 'পঞ্চম জাতি' নামেও পরিচিত ছিল। তাদের দলিত বলা হত। এদের ব্রিটিশ সরকার তপশিলি জাতি বলে চিহ্নিত করে। মাহার, চামার, পাদার, মালা, মেদিগা, এঙ্গাভা, হাড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, শবর, পুলিন্দ, নমঃশূদ্র ইত্যাদি জাতি দলিতের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৯ দার কমিশন (১৯৪৮) কেন গঠিত হয়েছিল?

১৯৪৭ খ্রিঃ ভারত স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন ভারতীয় অঙ্গরাজ্য এবং ভারতে যোগ দেওয়া বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলির সীমানা জাতি না ভাষার ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। এই প্রশ্নের মীমাংসার উদ্দেশ্যে দার কমিশন (১৯৪৮) গঠিত হয়।

৩.১০ পত্তি শ্রীরামালু কে ছিলেন?

পত্তি শ্রীরামালু ছিলেন অন্ধ্রের তেলেগুভাষী গান্ধিবাদী নেতা। তিনি মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগু ভাষাভাষী ১১টি জেলা নিয়ে একটি পৃথক রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবিতে ১৯৫২ খ্রিঃ ১৯ অক্টোবর আমরণ অনশন শুরু করেন। ৫৮ দিন পর তাঁর মৃত্যু হয়। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রতিটি জেলাতেই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় মন্ত্রীসভা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অন্ধ্রের ইতিহাসে পতি শ্রীরামালু 'অমরজীবী' নামে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

৩.১১ 'ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি' কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

১) পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলা। (২) পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দেশে সাম্যবাদের প্রসার ঘটানো। (৩) বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

৩.১২ রশিদ আলি দিবস কেন পালিত হয়?

ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ খ্রিঃ ১০ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ক্যাপটেন আবদুল রশিদ আলিকে বিচারে সাত বছর সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়। এই অবিচারের প্রতিবাদে কলকাতার সমস্ত ছাত্র সংগঠন ১১ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। ১২ ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের সঙ্গে ব্রিটিশ পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ক্যাপটেন আবদুল রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি 'রশিদ আলি দিবস' পালন করে।

৩.১৩ ১৯৫০ সালে কেন নেহরু লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল?

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন, উভয় দেশের উদ্‌বাস্তুদের তাদের মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নেওয়া, ফিরে যাওয়া উদবাস্তুদের পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া, অপহৃতা উদ্‌বাস্তু নারীদের ফিরিয়ে দেওয়া, সংখ্যালঘুদের অধিকার সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে ১৯৫০ খ্রিঃ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৩.১৪ বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের ভূমিকা ঃ

বাংলার ছাপাখানার বিকাশে পঞ্চানন কর্মকারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। (১) তিনি ছিলেন বাংলা ভাষার ছাপাখানার হরফ নির্মাণের অন্যতম রূপকার। (২) তিনি বাংলা ছাপাখানায় সচল ধাতু হরফের প্রচলন করেছিলেন।

৩.১৫ দীপালি সংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৯২৩ খ্রিঃ ঢাকায় লীলা নাগ 'দীপালি সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘের উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরী করা। মেয়েদের সাহস ও শক্তি বাড়াতে লাঠিখেলা, শরীরচর্চা ও অস্ত্র চালানো শিক্ষা দেওয়া হত।

৩.১৬ কী পরিস্থিতিতে কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করেন?

কাশ্মীর রাজ্যের ঐতিহ্য ছিল স্বাধীন রাজ্যরূপে উপস্থিতি তাই কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ভারত অথবা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ খ্রিঃ ২২ অক্টোবর পার্ক মদতপূর্ণ উপজাতিদের নিয়ে গঠিত হানাদার বাহিনী পাঠিয়ে পাকিস্তান কাশ্মীর গ্রাস করার পরিকল্পনা করেছিল। পাক-মদতপুষ্ট হানাদারগম কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করলে হরি সিং বুঝতে পারেন যে, তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর পক্ষে কাশ্মীর রক্ষা করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে হরি সিং ২৪ অক্টোবর ভারতের কাছে সামরিক সাহায্য চান। কিন্তু ভারত সরকার জানায় যে, হরি সিং ভারতভুক্তির দলিলে স্বাক্ষর করলে তবেই ভারত কাশ্মীরে সেনা পাঠাবে। এই অবস্থায় ১৯৪৭ খ্রিঃ ২৬ অক্টোবর হরি সিং 'ভারতভুক্তির 'দলিল' -এ স্বাক্ষর করে সরকারিভাবে ভারত ইউনিয়নে যোগদান করেন।

বিভাগ- খ

৪। সাত বা আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

উপবিভাগ ঃ খ.১

৪.১ ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহকে কি সামন্ত শ্রেণীর বিদ্রোহ বলা যায়?

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি বা স্বরূপ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য দুটি বিতর্ক হল (১) কেউ কেউ একে সামন্তশ্রেণির বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। (২) আবার কেউ কেউ একে জাতীয় বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন।

পক্ষে যুক্তি ঃ বিশিষ্ট ঐতিহাসি ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, রজনীপাম দত্ত প্রমুখ ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণির বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। ডঃ মজুমদারের মতে, এই বিদ্রোহ ছিল অভিজাততন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের মৃত্যুকালীন আর্তনাদ। এই বিদ্রোহকে সামন্ত শ্রেণির বিদ্রোহ বলার পক্ষে যে সব যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলি হল-

১) সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিস্বার্থ ঃ অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের মতে, ১৮৫৭-র বিদ্রোহে জাতীয় স্তরের পরিকল্পনা গড়ে ওঠে নি। আসলে হতাশাগ্রস্ত সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতার মধুভান্ড পাওয়ার লোভে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল মাত্র।

২) প্রতিক্রিয়াশীল ঃ ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। ভারতে অতি দ্রুত ইংরেজ শাসন বিস্তৃত হলে এদেশের সামন্তপ্রভুরা ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বিদ্রোহের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নেয়। ডঃ সেনের মতে, এই বিদ্রোহের নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রতিবিপ্লব।

৩) ভৌমিক অধিকার ফিরে পাওয়ার আশা ঃ ১৮৫৭-র বিদ্রোহে যে সকল অসামরিক লোকজন্য অংশগ্রহণ করেন তাদের নেতৃত্বের রাশ ছিল জমিদার ও সামন্তপ্রভুদের হাতে। নানাসাহেব, লক্ষীবাঈ, কুণওয়ার সিং সহ অনেক সামন্ত নেতা এই বিদ্রোহে যোগ দেন। আসলে ব্রিটিশদের সরকারী নীতির ফলে সামন্তরা যে চিরাচরিত ক্ষমতা হারান, তা পুনরায় ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যেই তাঁরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান কিংবা জাতীয়তাবাদী উপাদান নিশ্চয় ছিল। তাই বলে এই বিদ্রোহকে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক বলা যুক্তিযুক্ত নয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় 'India in Transition' গ্রন্থে বিদ্রোহকে 'সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া' রূপে চিহ্নিত করেছেন। অনুরূপভাবে রজনীপাম দত্তের মতে মহাবিদ্রোহটিকে 'সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া' রূপে চিহ্নিত করেছেন। সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণির হাতে ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু বলা চলে না। জওহরলাল নেহরু মার্কসীয় লেখকদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ১৮৫৭ খ্রিঃ অভ্যুত্থানকে সামন্ততান্ত্রিক ও পশ্চাদবর্তী চরিত্র ব্যক্ত করেছেন।

৪.২. 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' কে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয় কেন?

১৮৩৬ খ্রিঃ ৮ ডিসেম্বর গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, টাকির জমিদার কালীনাথ রায়চৌধুরী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখের উদ্যোগে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণ কার। ১৯২৮ খ্রিঃ সরকার নিষ্কর জমির ওপর কর বসালে এই সভা প্রতিবাদ স্বরূপ একটি জনসভা গঠনের চেষ্টা করেন। অনেকে মনে করে যে, এই সভা ভারতের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। যোগেশচন্দ্র বাগলের ভাষায় 'বাঙালি তথা ভারতবাসীর মধ্যে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' হল বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা। ১৮৫২ খ্রিঃ ২ মার্চ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় লিখেছিলেন 'রাজকীয় বিষয় বিবেচনার জন্য অপর যে সভা হইয়াছিল, তার মধে বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভাকে

৪.৩ বাংলায় মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের কীরূপ অবদান ছিল?

অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রথম বাংলায় আধুনিক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বাঙালিও মুদ্রণ শিল্পের বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর রাখেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য।

১) শিক্ষানবিশ ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য' নামে গ্রন্থটি থেকে তাঁর সম্পর্কে জানা যায়। গঙ্গাকিশোর প্রথম জীবনে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ করতেন। এখানে থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিনি পরবর্তীকালে কলকাতায় এসে বই প্রকাশের কাজ শুরু করেন।

২) সচিত্র বই ঃ গঙ্গাকিশোর ফেরিস এন্ড কোম্পানি প্রেস থেকে ১৮১৬ খ্রিঃ কবি ভারতচন্দ্রে সচিত্র অন্নদামঙ্গল কাব্যটি ছাপেন। এটিই ছিল বাঙালিদের সম্পাদনায় প্রথম সচিত্র বই। তৎকালীন বিখ্যাত শিল্পী রামচাঁদ রায়ের আঁকা ছবি এই বইয়ে ব্যবহার করা হয়।

৩) বাঙ্গালি গেজেটি প্রেস ঃ অন্নদামঙ্গলের ব্যাপক বিক্রিতে উৎসাহিত হয়ে গঙ্গাকিশোর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ১৮১৬ খ্রিঃ কলকাতায় বাঙ্গালি গেজেটি প্রেস স্থাপন করেন। এটি ছিল বাঙ্গালি মালিকানায় প্রথম ছাপাখানা। তিনি এখান থেকে নিজ সম্পাদনায় বাঙ্গাল গেজেটি প্রকাশ করতে থাকেন।

৪) বিভিন্ন বই ঃ অন্নদামঙ্গল কাব্য ছাড়াও গঙ্গাকিশোর বিভিন্ন বই প্রকাশ করেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'এ গ্রামার ইন ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলি', 'গণিত নামতা ব্যাকরণ লিখবার আদর্শ', 'দায়ভাল', 'চিকিৎসার্ণব', 'শ্রীমদ্ভাগবতগীতা', 'দ্রব্যগুণ' প্রভৃতি।

বাঙ্গালিদের মধ্যে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যই ছিলেন প্রথম সংবাদপত্র সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রথম বাংলা সচিত্র বইয়ের প্রকাশক। তাঁর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এরপর থেকে বহু বাঙ্গালি নিজেদের উদ্যোগে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে বইপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশনার জগতে প্রবেশ করেন।

৪.৪ ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর ঃ

আঠারো শতকের শেষ দিক থেকে উনিশ শতকে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ছাপাখানার ছাপা বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে-

১) শিক্ষাবিস্তার ঃ ছাপাখানা চালু হওয়ার পর বাংলা ভাষায় প্রচুর বই (যেমন পীয়ারমলের 'বাক্যাবলী', লখনের 'পশ্বাবলী', রাধাকান্ত দেবের 'বেঙ্গলী স্পেলিং বুক', হারলের 'গণিতাঙ্ক') ছাপা শুরু হলে শিক্ষার্থীরা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ পাওয়ায় বাংলাদেশে শিক্ষার বিস্তার ঘটে।

২) শিশুশিক্ষার প্রসারঃ ছাপাখানা শিশু শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর রচিত 'শিশুশিক্ষা' ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বর্ণপরিচয় এবং রামসুন্দর বসাক রচিত 'বাল্যশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থের কালজয়ী ভূমিকার কথা বলা যায়।

৩) গণ শিক্ষার বিস্তার ঃ ছাপাখানার ফলে স্কুল-কলেজ শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি গণ শিক্ষারও বিস্তার ঘটে। 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ', 'কাশীদাসী মহাভারত', 'বাঙ্গলার ইতিহাস' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস গ্রন্থের পাশাপাশি বাংলা বিষয়ের উপর রচিত বিচিত্রধর্মী গ্রন্থ এবং 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের ও শিক্ষার প্রসার ঘটে।

৪) সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা উদ্যোগে গতি ঃ ছাপাখানার ফলে দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানে সরকারী ও বেসরকারী উৎসাহদান বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট শিন এবং ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে বাংলায় স্কুল পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পরিবেশনার কথা বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলা ছাপাখানার প্রবর্তনের ফলে বাংলায় ছবি, মানচিত্র, নকশা ছাপানোর পাশাপাশি গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, অভিধান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তন সম্ভব হয় এবং শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের কাছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানজগতের দরজা উন্মোচিত হয়।

৪.৫ টীকা ঃ মাষ্টারদা সূর্য সেন

বিপ্লবী সূর্যকুমার সেন বিপ্লবীদের কাছে 'মাষ্টারদা' নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর জন্ম ১৮৯৩ খ্রিঃ চট্টগ্রামের গেরালাগ্রামে। বহরমপুর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিনি উমাতার উচ্চ বিদ্যালয়ের গণিত শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে অনুশীলন ও যুগান্তর গোষ্ঠীর অনুসরণে তিনি একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেছিলেন। এই সময় থেকে বিপ্লবী কাজের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার সন্দেহে ১৯২৫ খ্রিঃ ৮ই অক্টোবর পুলিশ তাঁকে মেদিনীপুরের হিজলি ও রত্নগিরি জেলে বেশ কিছুকাল বন্দী রাখেন। ১৯২৮ খ্রিঃ মুক্তিলাভের পর সূর্যসেন সুভাষচন্দ্র বসুর চেষ্টায় 'চট্টগ্রাম প্রদেশ কংগ্রেসের' সভাপতি নিযুক্ত হন (১৯২৯)। এই সময় সূর্য সেনের পাঁচ অনুগামী 'চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটির' সদস্যপদ লাভ করেন।

সূর্য সেনের জীবনে সবচেয়ে বড় ঘটনা ১৯৩০ খ্রিঃ ১লা এপ্রিল ৬৪ জন বিপ্লবীকে নিয়ে 'ইন্ডিয়ান রিপাবলিকারন আমি' গঠন। ১৯৩০ খ্রিঃ ৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের এই বিপ্লবী দল চার ভাগে ভাগ হয়ে চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার, পুলিশ অস্ত্রাগার, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেলপথ ধ্বংস করতে অগ্রসর হন। সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠ করে আগুন জ্বালিয়ে দেন। তাঁর বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট সদস্যরা হলেন লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ. অনন্ত সিংহ প্রমুখ। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সূর্য সেন তাঁর অনুগামীদের নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। চারদিন অবরোধের পর সরকারী সেনার সঙ্গে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির বিপ্লবীদের তুমুল যুদ্ধ চলে। ইহা 'জালালবাদের মুক্তিযুদ্ধ' নামে পরিচিত। বিপ্লবীরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ চালিয়ে ব্রিটিশ সেনাদের পিছু হঠতে বাধ্য করেছিলেন। ইতিমধ্যে বিপ্লবীরা 'ভারতীয় অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' গঠন করেছিলেন। সূর্য সেনের 'প্রকাশ্য যুদ্ধ' -এ বহু বিপ্লবী মারা যান। জালালাবাদের পর বিপ্লবীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ শুরু করেন। সূর্য সেনের সহযোগী তরুণী কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার জালালাবাদে পাহাড়ের একটি ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করতে গিয়ে এক উচ্চপদস্থ কর্মীকে হত্যা করলেও আহত প্রীতিলতা পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তারপর কর্ণফুলির যুদ্ধে সূর্য সেনের বেশ কিছু সহকর্মী মারা যান। অবশেষে আত্মগোপন করে থাকার সময় নিজের গ্রাম গেরালা থেকে সূর্য সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ১৯৩৩ খ্রিঃ ২রা ফেব্রুয়ারী। ১৯৩৪ খ্রিঃ ১২ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের জেলে ফাঁসী হয়। 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকাতে পরের দিন সেই খবর ছাপা হয়। তাঁর মৃত্যুর দশ বছর পর সুভাষচন্দ্র বসু তার অনুসারীরূপে বাংলাতে সর্বশেষ অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছেন। স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনা 'বিপ্লবের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা'।

৪.৬ দলিত আন্দোলন বিষয় গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ক নিয়ে একটি টীকা লেখ ঃ

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে দলিত অধিকার বিষয়ে গান্ধিজি ও ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

মতপার্থক্য ঃ ক) দৃষ্টিভঙ্গিগত ঃ আম্বেদকর ১৯২০ খ্রিঃ অসহযোগ আন্দোলনকালে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ নিয়ে গান্ধিজির কর্মসূচির সঙ্গে আম্বেদকরের মতামতের পার্থক্য হয়েছিল। আম্বেদকর শিক্ষা, চাকরি ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও দলিতদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন।

খ) পদ্ধতিগত ঃ গান্ধিজি দলিতদের সমস্যাকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিচার করতেন। দলিতদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার বা উচ্চ বর্ণের সঙ্গে একত্রে বসে খাওয়ার অধিকার দানের ওপর গুরুত্ব দেন। পক্ষান্তরে বি. আর. আম্বেদকর গান্ধিজিকে বলেছিলেন - 'দলিতদের জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া, উচ্চবর্ণের সঙ্গে বসে খাওয়া ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের প্রতি আমার কোনো উৎসাহ নেই, কারণ এসব সত্বেও আমরা দলিতরা দুর্দশা ভোগ করি। আমি শুধু চাই দলিতদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থার অবসান ঘটুক' আম্বেদকর দলিত অধিকারকে আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

গ) বর্ণাশ্রম সম্পর্কিত ঃ গান্ধিজি অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধিতা করলেও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। তবে তিনি বর্ণগুলির মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের ওপর গুরুত্ব দেন। কিন্তু আম্বেদকর ১৯৩৫ খ্রিঃ গান্ধিজির বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ও বর্ণ হিন্দুদের অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করেন।

ঘ) রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত ঃ ১৯২৮ খ্রিঃ বি. আর. আম্বেদকর দলিত সমাজের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার জন্য দলিতদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী দাবি করেন। ১৯৩২ খ্রিঃ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' নীতি ঘোষণা করেন। এর দ্বারা হিন্দু সমাজকে বর্ণ-হিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণি - এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

আম্বেদকর দলিত মানুষদের আলাদা নির্বাচনের অধিকারের পক্ষেই ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির প্রতিবাদে অনশনরত গান্ধিজির প্রাণনাশের আশঙ্কায় আম্বেদকর গান্ধিজির সঙ্গে পুনা চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয়েছিলেন।

ডঃ বি. আর. আম্বেদকর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে দলিতদের জন্য রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও পুনা চুক্তির মাধ্যমে সেই অধিকার অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছিলেন।

৪.৭ স্বাধীনতার পরে ভাষার ভিত্তিতে ভারত কীভাবে পুনর্গঠিত হয়েছিল?

১৯৪৮ খ্রিঃ জুন মাসে এস কে ধরের নেতৃত্বে 'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিশন' এবং ১৯৪৮-এর ডিসেম্বর 'ভাষাভিত্তিক প্রদেশ কমিটি' বা জে ভি পি কমিটি তাদের রিপোর্টে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের বিপক্ষে রিপোর্ট দেয়। কিন্তু তেলেগুভাষী, গান্ধিবাদী পতি শ্রীরামালু ১৯৫২ খ্রিঃ ১৯ অক্টোবর মাদ্রাজের তেলেগুভাষী ১১টি জেলা নিয়ে পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের দাবীতে আমরণ অনশন শুরু করেন। একটানা ৫৮ দিন অনশন চালানোর পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ১১টি জেলার সব কটিতেই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হয় । শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৩ খ্রিঃ ১ অক্টোবর মাদ্রাজ প্রদেশের তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি বিযুক্ত করে অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করে।

রাজ্যগঠন আদর্শ ঃ তেলেগুভাষীদের জন্য পৃথক অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য গঠিত হলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে। এই প্রেক্ষাপটে ফলল আলির নেতৃত্বে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন গঠিত হয় ১৯৫৩ খ্রিঃ। এই কমিশন তার রিপোর্টে ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করার পক্ষেই রায় দেয়। পরে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সংসদে পাশ হয় রাজ্য পুনর্গঠন আইন (নভেম্বর ১৯৫৬ খ্রিঃ)

ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন ঃ 'রাজ্য পুনর্গঠন আইন' অনুসারে ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব করা হয়। এই আইনের ভিত্তিতে (ক) তেলেঙ্গানা অঞ্চলকে হায়দ্রাবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্ধ্রপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। (খ) হায়দ্রাবাদের মারাঠি ভাষাভাষী অঞ্চল এবং সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছকে বোম্বাই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। (গ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির মালাবার অঞ্চলকে ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের সঙ্গে যুক্ত করে কেরালা রাজ্য গড়ে তোলা হয়। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু এলাকা ও পুরুলিয়া যোগ করা হয়।

প্রতিক্রিয়া ঃ এইভাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠিত হলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত ১৯৬০ খ্রিঃ বোম্বাই প্রদেশকে দু ভাগ করে মারাঠাভাষী মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটিভাষী গুজরাট রাজ্য গঠন করা হয়। ১৯৬৬ খ্রিঃ পাঞ্জাবকে পাঞ্জাবি, হিন্দি ও পাহাড়ি অঞ্চলে বিভক্ত করে যথাক্রমে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও হিমাচল প্রদেশ রাজ্যে পরিণত করা হয়।

৪.৮ হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি কীভাবে ভারতভূক্ত হয়েছিল?

১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ই আগস্টের আগে জুনাগড়, কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ ছাড়া বাকি সব দেশীয় রাজ্যই ভারতে যোগদান করেছিল। হায়দ্রাবাদ ছিল ভারতের সবচেয়ে বড়ো দেশীয় রাজ্য। এটি পুরোপুরিই ভারতীয় ভূ-খন্ড দ্বারা বেষ্টিত। হায়দ্রাবাদের শাসক নিজাম নামে পরিচিত ছিলেন।

হায়দ্রাবাদের নিজামের পরিকল্পনা ঃ ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিলেন ওসমান আলি খান। হায়দ্রাবাদের জনসংখ্যার ৮৫শতাংশ ছিল হিন্দু। নিজাম ও তাঁর অভিজাতরা প্রথমে স্বাধীন থাকার পরিকল্পনা করেন, পরে পাকিস্তানে যোগদানের কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু ৮৫শতাংশ জনসাধারণের দাবি ছিল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

তিনটি ঘটনায় জটিল পরিস্থিতি ঃ (ক) সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 'মজলিস ইত্তিহাদুল মুসলিমিন' গঠন করে নিজাম ও অভিজাতরা 'রাজাকার' নামে এক উগ্র সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র দাঙ্গা বাহিনীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসের শাসন কায়েম করেন। (খ) হায়দ্রাবাদ রাজ্য কংগ্রেস নিজামের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু করেছিল। (গ) কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা অঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থান তীব্ররূপ নিয়েছিল।

সেনা অভিযান ঃ এই পরিস্থিতিতে হায়দ্রাবাদের আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটলে ১৯৪৮ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে নেহরু সরকার ভারতী সেনা বাহিনী পাঠিয়ে হায়দ্রাবাদ দখল করে নেয়।

ভারতভূক্তির দলিলে স্বাক্ষর ঃ হায়দ্রাবাদের নিজাম কিছুদিন পর ভারতভূক্তির দলিল-এ স্বাক্ষর করেন ১৯৫০ খ্রিঃ ২৬ জানুয়ারি হায়দ্রাবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়।

বিভাগ- ঙ

৫.১ বাংলায় কারিগরী শিক্ষার বিকাশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ঃ

উনিশ শতকে বাংলায় আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ও বিজ্ঞান শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটে। এর ফলে কারিগরি শিক্ষার দ্রুত প্রসার ও অগ্রগতি শুরু হয়। এ বিষয়ে কয়েকজন ইংরেজ ও ভারতীয়র উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

১। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠা ঃ বাংলার সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ১৮৫৬ খ্রিঃ কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ প্রতিষ্ঠিত ক্যালকাটা কলেজ অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। কলেজটি ১৮৫৭ খ্রিঃ শিবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং এর নতুন নাম হয় 'বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' এই কলেজ ১৮৮০ খ্রিঃ থেকে ডিগ্রি প্রদান শুরু করে।

২) কারিগরি শিক্ষার প্রসারের ছবি ঃ উনিশ শতকের শেষ দিকে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংবাদপত্রগুলিতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের দাবি জানানো শুরু হয়। এর পরিণতি হিসেবে কলকাতায় 'অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এডুকেশন (১৯০৪ খ্রিঃ)' যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৯০৬ খ্রিঃ) প্রভৃতি গড়ে ওঠে।

৩) বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট - ১৯০৫ খ্রিঃ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে দেশে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সূত্রেই বাংলায় স্বদেশি ধাঁচে কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এই উদ্দেশ্যে আইনজীবী তারকনাথ পালিতের প্রচেষ্টায় ১৯০৬ খ্রিঃ ২৫ জুলাই কলকাতায় বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট নামে একটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে বাংলায় বহু শিক্ষিত যুবক কারিগরি বিদ্যা লাভ করে স্বনির্ভর ও সাবলম্বী হয়ে ওঠে।

৪) CET ঃ দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৯১০ খ্রিঃ বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউট ও বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ একত্রে মিশে যায়। এর নতুন নাম হয় বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড টেকনিকাল স্কুল। ১৯২৮ খ্রিঃ এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের নাম হয় কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি বা CET।

জ্ঞানচর্চার শাখা ঃ CET -এ কলাবিভাগের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রযুক্তি, শিল্প প্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থা হয়।

জার্নাল প্রকাশ ঃ CET এর ছাত্রছাত্রীরা 'টেক' নামে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। এই জার্নালের প্রথম সংখ্যাটি তাঁরা স্বদেশি আন্দোলনের যুগের সেই সকল আত্মত্যাগীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন যাঁরা জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

উপসংহার ঃ ব্রিটিশ শাসক ও শিল্পপতিরা কারিগরি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের অদক্ষ বলে মনে করত - এজন্য তারা কারিগরি শিক্ষার যথার্থ ও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করায় বাংলায় কারিগরি শিক্ষার প্রসার ব্যহত হয়। তবে স্বাধীনতার পরে ভারতে কারিগরি শিক্ষার প্রসারে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয় এর মধ্যে অন্যতম হল ভারতের বিভিন্ন শহরসহ পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুরে ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি (১৯৫১)-র প্রতিষ্ঠা।

৫.২ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বর্হিভারতে রাজনীতিতে নারী অংশগ্রহণের ঘটনা ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে নারী শক্তির গুরুত্বকে বৃদ্ধি করে। রাজনীতিতে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের তত্ত্ব ও ক্রমশই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রেক্ষাপট ঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের প্রেক্ষাপট রচিত হয়। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্রের কন্যা কুমুদিনী মিত্র তাঁর সুপ্রভাত পত্রিকার মাধ্যমে দেশপ্রেমের আদর্শ নারীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ ছাড়া মীরা দাশগুপ্তার সম্পাদিত 'বেণু' পত্রিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ঃ

১) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পর্ব ঃ এই আন্দোলনের সময় বাংলার কয়েকজন নারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দান, গোপনে সংবাদ প্রেরণ ও অস্ত্র সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন। এ প্রসঙ্গে ননীবালা দেবীর কথা বলা যায়। এ ছাড়া সরলাদেবী চৌধুরাণীর প্রতিষ্ঠিত লক্ষীর ভান্ডার ও বীরাঙ্গনা ব্রত স্বদেশী চেতনার বিকাশে সাহায্য করেছিল।

২) দিপালী সংঘ ঃ বিপ্লবী লীলা রায় (নাগ) কর্তৃক ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত দিপালী সংঘের (১৯২০ খ্রিঃ) উদ্যোগে নারীদের লাঠিখেলা, শরীরচর্চা, অস্ত্র চালানো, অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এই সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ছাত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

৩) প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ঃ বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার সূর্য সেনের সহযোগী ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী চট্টগ্রামের পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ক্লাব বিপর্যস্ত করে দেয় এবং পটাশিয়াম সায়ানাইড বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন।

৪) কল্পনা দত্ত ঃ চট্টগ্রামের বিখ্যাত বিপ্লবী নারী কল্পনা দত্ত বিপ্লবী দলের গোপন কাগজপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তা ছাড়া তিনি বন্দি বিপ্লবী নেতাদের মুক্ত করা জন্য 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্র' করেছিলেন।

৫) সান্তি ও সুনীতি ঃ কুমিল্লার দুইজন ছাত্রী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সি.জি.ভি. স্টিভেনকে গুলি করে হত্যা করেন।

আবার উজ্জ্বলা মজুমদার দার্জিলিং-এ গভর্ণর এ্যান্ডারসনকে হত্যার চেষ্টা করলে ধরা পড়েন ও জেলবন্দী হন।

৬) বীণা দাস ঃ আধা বৈপ্লবিক সংগঠন 'ছাত্রী সংঘ' -এর সদস্য তথা কলেজ ছাত্রী বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সময় সেনেট হলে গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে হত্যার জন্য গুলি করেন (৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ খ্রিঃ) জ্যাকসন অল্পের জন্য বেঁচে যান এবং জ্যাকসনকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে বীণা দাসের নয় বছর কারাদন্ড হয়।

৭) লক্ষী সায়গল ঃ আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী 'ঝাঁসী ব্রিগেডের' দায়িত্ব প্রাপ্ত লক্ষী স্বামীনাথন বা লক্ষী সায়গলের বৈপ্লবিক কাজকর্মও খুব উল্লেখযোগ্য ছিল।

পর্যালোচনা ঃ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল সীমিত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় পুরুষ বিপ্লবীদের তুলনায় নারী বিপ্লবীদের দায়িত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া এইরূপ সশস্ত্র আন্দোলন মূলত বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল।

৫.৩ বিংশ শতকের ভারতে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা আলোচনা কর।

বাঙ্গালি বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের হাত ধরেই রাশিয়ার তাসখন্দে ১৯২০ খ্রিঃ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভারতের উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন এক অন্যরূপ ধারনে করে। ১৯২৫ খ্রিঃ কানপুরে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন হয় এবং এখানেই সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের সভাপতত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকেই ভারতে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে।

১) কৃষক শ্রমিক আন্দোলনে বামপন্থীদের ভূমিকা ঃ বাংলায় মুজাফ্ফর আহমেদ, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ কমিউনিস্টরা শ্রমিক ও কৃষকদের সংগঠিত করে 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্' পার্টি গঠন করেন (১৯২০ খ্রিঃ) এই পার্টির অনুকরণে বোম্বাই, পাত্রদ্ধা ও যুক্তপ্রদেশে অনুরূপ পার্টি গড়ে ওঠে। ১৯২৮ খ্রিঃ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি'।

২) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ঃ ঔপনিবেশিক সরকার কমিউনিস্টদের দখল করার জন্য ১৯২৯ খ্রিঃ ৩২ জন কমিউনিস্ট নেতা বা শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে এক মামলা শুরু করেন যা মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। এই মামলায় মুজফ্ফর আহমেদ, কিশোরীলাল ঘোষ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, গোপাল বসাক এবং শিবনাথ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্ত হন।

৩) কলকাতা কমিটি ঃ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পরবর্তীকালে আবদুল হালিম প্রমুখ কমিউনিস্ট নেতা বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন বজায় রাখেন। হালিমের নেতৃত্বে ১৯৩১ খ্রিঃ গঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা কমিটি।

৪) ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগ ঃ ১৯৩১ খ্রিঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান প্রলেতারিয়ান রেভলিউশনারি পার্টি'। পরবর্তীকালে এই পার্টি কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগদান করে।

বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন ছিল ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিত্তির রূপকার বামপন্থী বা কমিউনিস্টরা উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

2.4

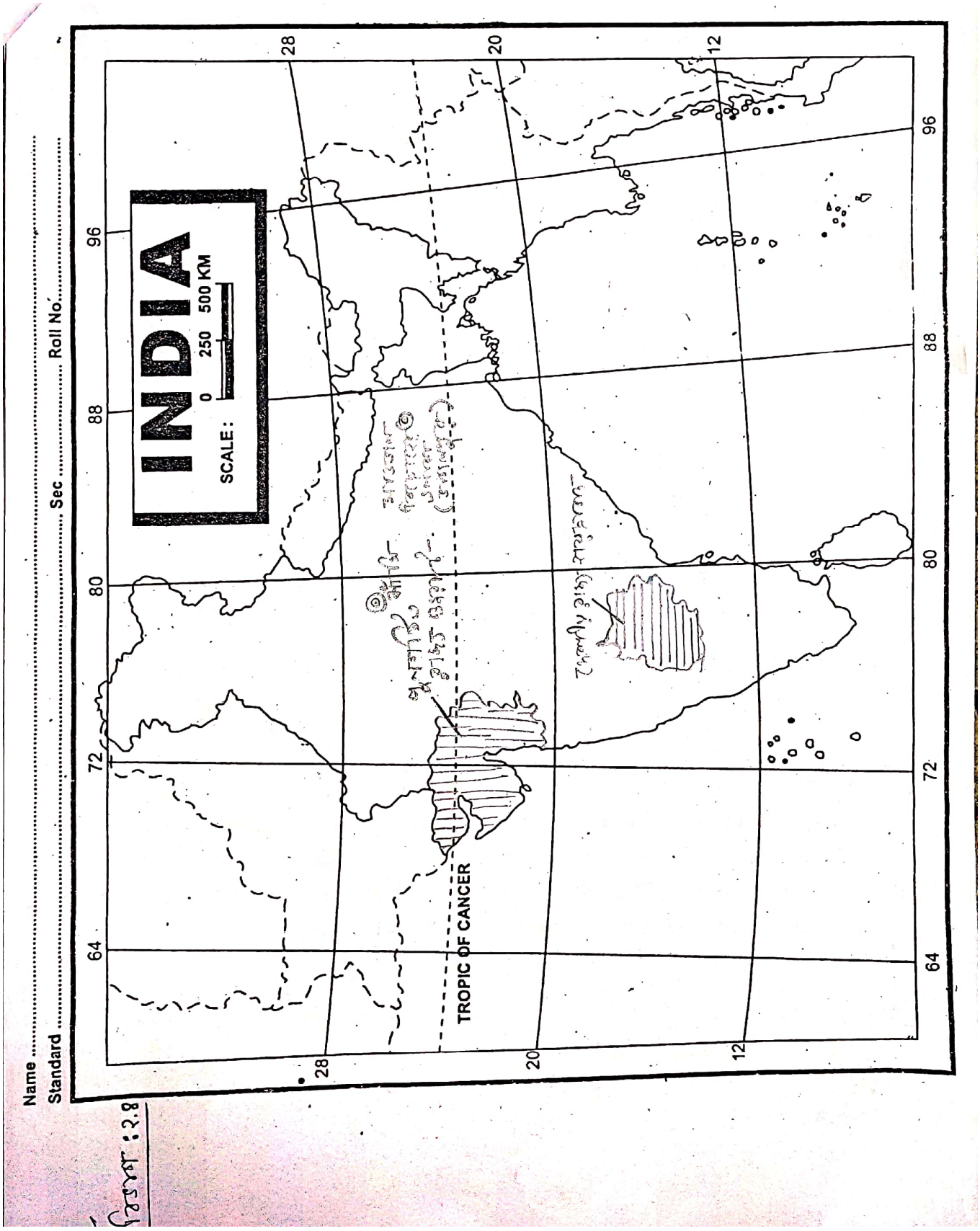
Name .....
Standard .....
Sec .....
Roll No .....
INDIA
SCALE: 0 250 500 KM
TROPIC OF CANCER
28
20
12
96
88
80
72
64